বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম স্মারক বক্তৃতা, ১৯৯৯

বাংলাদেশ ২০১০

মুহাম্মদ ইউনূস

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
১৫ অক্টোবর ১৯৯৯

উৎসর্গ

বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম স্মারক বক্তৃতা দেবার জন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এবছর আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এ দায়িত্ব গ্রহণে আমি প্রবল সংকোচ বোধ করেছি। আমার বক্তব্যের দুর্বলতা যেন তাঁর স্মৃতির ঔজ্জ্বল্যকে স্পর্শ করতে না-পারে এনিয়েই আমার উৎকণ্ঠা। উচ্চ আদালতের বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং পাকিস্তানের আইন মন্ত্রীর পরিচয় ছাড়াও ব্যক্তি মোহাম্মদ ইব্রাহীমের পরিচয় আরো বিশাল। সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার যে উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন সেটা দেশের মানুষকে নতুন করে আবার অনুপ্রাণিত করুক --- এই কামনা করে আমার নিবন্ধ তাঁর স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করছি।

বাংলাদেশ ২০১০

পৃথিবী অতি দ্রুত বদলে যাবে

গত পাঁচ হাজার বছরের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিবর্তন একটি সুনির্দিষ্ট খাতে বয়ে এসেছে ইতিহাসের একটি ক্ষীণ ধারা হিসেবে। পথ চলতে চলতে ধারাটি কিছুটা প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ চোখে পড়ার মত চেহারা বদলায়নি কখনো। এর ব্যতিক্রম এসেছে পাঁচহাজার বছরের শেষ দু'শ বছরে। শেষের এই দু'শ বছরে পরিবর্তন এসেছে চোখে পড়ার মত। বিবর্তনের খাত কিঞ্চিত প্রশস্ত হয়েছে, স্রোত স্ফীত হয়েছে। হয়েছে দ্রুততর। আলোড়ন উঠেছে মানুষের চিন্তাভাবনায়। এই সময় চিন্তাভাবনা বিবর্তিত হয়েছে সকল মানুষের সমান অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা নিয়ে, ব্যক্তি মানুষকে সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল নিয়ন্তা হিসেবে চিহ্নিত করা নিয়ে, মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে কমিয়ে এনে বুদ্ধি খাটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, এবং সকল ক্ষেত্রে শক্তি বৃদ্ধি করা নিয়ে। এর মাঝে আবার শেষ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বিবর্তনের ধারায় গতি বেশ বেড়েছে। স্রোত স্ফীত হয়েছে লক্ষণীয়ভাবে। এতে এমন সব লক্ষণ ধরা পড়ছে যাতে মনে হয় গত পাঁচ হাজার বছরের মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা, জীবনযাত্রার সকল প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাল্টে যাবে। বিবর্তনের ধারায় এই মহাপ্লাবনের সূচনাকারী শক্তিটি হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি। বিশেষ করে দু'টি নতুন প্রযুক্তি ঃ ক) নতুন ধারার তথ্য প্রযুক্তি এবং খ) নতুন ধারার জৈব প্রযুক্তি। আমার এই নিবন্ধ শুধু তথ্য প্রযুক্তিকে ঘিরে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ বিশ বছরে তথ্য প্রযুক্তিতে যে অকল্পনীয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তাতে অনায়াসে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আগামী পঞ্চাশ বছরে মানুষের হাতের ছোঁয়ায় লক্ষ লক্ষ বছরের পুরোনো পৃথিবীতে এমন সব পরিবর্তনের গোড়াপত্তন হবে যেগুলি মানুষও এখনো কল্পনা করতে পারছে না। এগুলি সম্ভব হবে এজন্যে যে তথ্য প্রযুক্তির আবিষ্কার শুধুমাত্র তথ্য প্রযুক্তিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এগুলি সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ছড়িয়ে পড়বে। যার ফলে মানুষ ও সকল প্রাণীর জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্তন আসতে শুরু করবে।

এক কথায় আমরা একটি নাটকীয় পরিবর্তনের মুখোমুখি। এই পরিবর্তনের ফলে অতীতের অতিপরিচিত, পরম নির্ভরযোগ্য বহু বিশ্বাস, বহু কাঠামো, বহু রেওয়াজ, বহু নিয়ম, বহু কনসেপ্ট অল্প দিনের মধ্যেই সুদূর ইতিহাসের অংশ হয়ে পড়বে। এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পরে দুনিয়া কিরকম দেখতে হবে সেটা লিখতে গেলে একটি সায়েন্স ফিকশান বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনা করতে হবে। আজকের দিনের একজন মানুষ রিপ ভ্যান উইংকলের মত যদি কোথাও ঘুমিয়ে পড়ে, আর পঞ্চাশ বছর পর জেগে উঠে, তাহলে তিনি বুঝতেই পারবেন না তিনি কি পৃথিবীতে আছেন, নাকি অন্য কোন উন্নত গ্রহে এসে পড়েছেন।

পঞ্চাশ বছর কেন, পঁচিশ বছর পর কি হবে সেটা লিখতে গেলেও কল্প কাহিনীর মত শোনাবে।

পৃথিবী পাল্টে যাবে বুঝলাম, তাতে আমাদের কী? বাংলাদেশ তো যে-তলানীতে সে-তলানীতেই থেকে যাবে। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের পালে হাওয়া লাগেনি, আগামী পঞ্চাশ বছরেও পালে হাওয়া লাগবে কিনা সন্দেহ। রিপ ভ্যান উইংকল যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর বাংলাদেশে ফিরে আসেন তাহলে হয়তো দেখবেন ঢাকাতে বস্তি আরো বেড়েছে, জনজীবন আরো দুঃসহ হয়েছে, যানজটে আটকে পড়া, কালো ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত ঢাকা শহরের মানুষ অদ্ভুত সব মুখোস পরে চলাফেরা করছে। সারা দেশে মাস্তান আর চাঁদাবাজরা পথের দখল, বাজারের দখল, অফিসের দখল নিয়ে দিনরাত মারাত্মক মারণাস্ত্র নিয়ে এদিক ওদিক ধাওয়া করছে। ঢাকা শহরের মত সারা দেশ যানজটে আটকে পড়েছে। কোথাও মাস্তানরা যানজট তৈরী করেছে, কোথাও ভাংগা রাস্তা কিংবা ভাংগা ব্রীজের কারণে যানজট লেগেছে, কোথাও স্থানীয় হাটবাজারের ভিড়ের কারণে, কোথাও স্থানীয় মারপিটের কারণে এই যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে আমার একটা অন্ধ বিশ্বাসের কথা আমি আগেভাগে জানিয়ে রাখি। দেশের মানুষের সুবুদ্ধি এবং নিজের ভাগ্য নিজে গড়ার এক অপূর্ব তাগিদের কারণে পঞ্চাশ বছর পরের বাংলাদেশ অবশ্যই আজকের বাংলাদেশ থেকে অনেক ভালো হবে বলে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ রিপ ভ্যান উইংকল কোন অবস্থাতেই আজকের বাংলাদেশ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের বাংলাদেশকে খারাপ অবস্থায় দেখবেন না। আমার ধারণা তিনি বরং অনেক ভালো অবস্থায় দেখবেন। কিন্তু আমার আজকের বক্তব্য সেটা নিয়ে নয়। আমার যে-বক্তব্যটা আজ তুলে ধরতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে --- আমার বিশ্বাস আমরা আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর এক বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ পেতে যাচ্ছি নতুন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে। এই সুযোগ যাতে কোনরকমে আমাদের হাত থেকে ফসকে যেতে না-পারে সেই আবেদন জানিয়েই আমার আজকের এই নিবন্ধ।

দশ বছরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করতে হবে

২০৫০ সাল অনেক দূরের সময়। সেটা দেখে যাবার সৌভাগ্য দেশের অর্ধেক মানুষের হবে না। কিন্তু ২০১০ সাল খুব কাছের একটা বছর। দেশের নব্বুই শতাংশ মানুষ এটা দেখে যাবেন। তাই আমি ২০১০ সালের বাংলাদেশ নিয়েই কথা বলবো।

একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের মুহূর্তে সারাদেশ এখন চরম হতাশার আবর্তে। সরকার, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব কিছু নিয়ে আমাদের হতাশা কেবলই বাড়ছে। অন্যদিকে ২৫ বছর আগে যেসব দেশের সঙ্গে আমরা এক কাতারে ছিলাম, যাদের শিক্ষা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতাম তারা আমাদের কাতার ছেড়ে বহু উপরের অর্থনৈতিক কাতারে চলে গেছে। দক্ষিণ কোরিয়া এখন উন্নত দেশ। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এশিয়ান সংকট কাটিয়ে আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠছে দ্রুত এগিয়ে যাবার জন্য। আমরা এখনো ২০০ টি দেশের মধ্যে প্রায় তলার দেশ। মাথাপিছু আয় ২৮০ ডলার। অর্থাৎ আমাদের ১৩ কোটি মানুষের দৈনিক মাথা পিছু আয় এক ডলারের চাইতেও কম। দেশের অর্ধেক মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে।

তথ্য প্রযুক্তি আমাদের সামনে যে সুযোগ এনে দিয়েছে আমরা যদি তার সদ্ব্যবহার করি তাহলে ২০১০ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করতে পারবো। দারিদ্রসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা অর্ধেক থেকে কমিয়ে এক-চতুর্থাংশে নিয়ে আসতে পারি। (যাতে ২০২০ সালের মধ্যে নিশ্চিত করতে পারি যেন দেশের সকল মানুষ দারিদ্রসীমার উপরে উঠে আসে।) অন্ততঃ এটাই হোক আমাদের লক্ষ্য। এতে আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সমকক্ষ অর্থনৈতিক মর্যাদায় শুধু অবস্থান করবো তাই নয় --- বরং আমাদের অর্থনীতিতে এমন শক্তি আসবে যাতে তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যাবার গতি আসবে। সব চাইতে বড় কথা, আমরা যদি এপথে দৃঢ়তার সঙ্গে পা বাড়াই তাহলে রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান হতাশা কাটিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাস জেগে উঠবে।

আমরা যদি নিজেদেরকে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে দাঁড় করাতে চাই তাহলে আগামী দশ বছরের মধ্যে এর চাইতে কম কিছু আমরা চাইতে পারি না। এর বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করাটাও সহজ হয়ে পড়েছে নতুন তথ্য প্রযুক্তি আমাদের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে বলে। এই নতুন প্রযুক্তির পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন নিশ্চিত পথ আমাদের নেই।

তথ্য প্রযুক্তি এমন একটি প্রযুক্তি, এটার প্রভাব শুধু আমেরিকা-ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। অর্থাৎ পৃথিবী যখন পাল্টাবে, তার সঙ্গে বাংলাদেশও পাল্টাবে। তথ্য-প্রযুক্তির মহাপ্লাবনকে বাঁধ বেঁধে আটকানোর ক্ষমতা কারো নেই। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের অর্থনীতি ফুঁসে উঠা বেলুনের মত প্রকান্ড হবে। তাদের তুলনায় আমাদের ছোট অর্থনীতিকে আরো ভীষণরকম ছোট দেখাবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় আমরা আরো অনেক দ্রুত সম্প্রসারিত হতে পারবো।

আমার আজকের এই নিবন্ধে আমি শুধু একটি বিষয়ের প্রতি দেশের সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ঃ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মহাপ্লাবন ক্রমান্বয়ে একে একে আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়াকে ভরিয়ে দিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ভারত এবং পৃথিবীর সকল দেশের ভান্ড ভর্তি করে দেয়ার পর কি শুধু উপছে পড়ে বাংলাদেশে আসবে, নাকি আমরা উদ্যোগ নিয়ে, আয়োজন করে, অন্য দেশে এই প্লাবন ঢোকার আগেই, কিংবা তাদের ভান্ড ভরার আগেই বাঁধ কেটে, খাল কেটে এই জোয়ার আমাদের দেশে নিয়ে আসবো ? আমরা যেভাবে চাই সেভাবেই হবে। ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে না --- এটা যেমন সত্য, ঘটনাকে আমরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আমাদের স্বার্থ অনুযায়ী ঘটাতে পারি, সেটাও সত্য।

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন ধারা ও নতুন ধারণা

নতুন তথ্য প্রযুক্তি এসে পুরোনো দিনের সাজানো গোছানো আয়োজনগুলি, চিন্তাগুলি সব তছনছ করে দিতে থাকবে। তথ্য প্রযুক্তি ইতিমধ্যে এক আনকোড়া নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে।

প্রথম কথা, এর মাধ্যমে পৃথিবী দূরত্বহীন হয়ে পড়ছে। পাশের বাড়ী, পাশের দোকান আর দুনিয়ার দুর্গমতম দেশের দুর্গমতম স্থানটির মধ্যে কোন তফাৎ থাকছে না। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান থাকছে না যেখান থেকে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে তাৎক্ষণিকভাবে কথা বলা যাচ্ছে না বা পরস্পরকে দেখা যাচ্ছে না। আরো একটা বড় কথা হলো, এসবকিছু সম্ভব হবে প্রায় ব্যয়হীনভাবে। খরচ এত কম লাগবে যে এটা একরকম ধর্তব্যের মধ্যে নয় বললেও চলে।

এই দূরত্বহীন পৃথিবীতে আমার অফিসের ঘনিষ্টতম সহকর্মীকে আমার পাশের কামরায় বসতে হবে এমন কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। তিনি পৃথিবীর যেকোন স্থানে থেকেই দৈনন্দিন ভিত্তিতে আমার সঙ্গে প্রতিনিয়ত “উঠাবসা” করতে পারেন। তার যেমন “অফিসে” আসার দরকার নেই, আমারও তেমনি একই কারণে “অফিসে” যাবার দরকার নেই। (কি মজা, রাস্তায় অফিসগামী লোকের ভিড় হবে না, একারণে যানজট হবে না!) অথচ “অফিসে”-র কাজ আগের মতই চলছে। পুরনো দিনের “অফিসের” ধারণা দ্রুত পাল্টে যেতে

বাধ্য হবে। তার জায়গায় "প্রায়-অফিস" বা ভারচুয়াল অফিস সৃষ্টি হবে। একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বহুদেশে বসবাসরত কর্মীগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে। এখনই তার সূচনা হয়েছে।

মানুষে মানুষে এই দূরত্বহীনতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যয়হীনতা গরীব দেশগুলির জন্য একটা অপূর্ব সুযোগের সৃষ্টি করেছে। নিউইয়র্কে চাকুরী করতে হলে নিউইয়র্কে (নিদেন পক্ষে নিউ জার্সীতে) থাকতে হবে, এই প্রয়োজনীয়তা এখন দ্রুত ফুরিয়ে যাবে। বাংলাদেশের সিংহজানী ইউনিয়নের ভাতুরিয়া গ্রামে বসে আপনি এখন নিউইয়র্কের *'স্যামস অ্যান্ড শাটাস্কী'* কোম্পানীর হিসাবরক্ষকের কাজ করতে পারবেন। এতে দু'পক্ষের লাভ। *'স্যামস অ্যান্ড শাটাস্কী'* নিউইয়র্কের একজন হিসাবরক্ষককে যে বেতন দিতো তার দশ শতাংশ বেতন দিয়ে একই কাজ পাচ্ছে। আপনি বাংলাদেশে যে বেতনে ঢাকা শহরে কাজ পেতেন তার চাইতে ভাল বেতনে নিজের গ্রামে বসে কাজ করছেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন।

বাংলাদেশ থেকে আমাদের পোষাক শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি জামা কাপড় তৈরী করে তা ইউরোপে বা আমেরিকায় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে সরবরাহ করেন। শুনেছি একটা জামা তৈরী করে, সুন্দর মোড়কে মুড়িয়ে দিয়ে, জাহাজে করে নিউইয়র্ক পর্যন্ত পৌঁছে দিলে এখানকার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পান পাঁচ ডলার। এতে সবার খরচ ধরা আছে। যিনি তুলা উৎপাদন করেছেন, যিনি সূতা তৈরী করেছেন, যিনি সূতা রং করেছেন, কাপড় বুনেছেন, জামা বানিয়েছেন, মোড়ক বানিয়েছেন, ট্রাকে করে চট্রগ্রাম পৌঁছে দিয়েছেন, জাহাজের ভাড়া, আনুসাংগিক সরকারী কর ইত্যাদি। কিন্তু জামাটি যখন নিউইয়র্ক শহরের একটি দোকানে রেখে বিক্রী করা হয় তখন ক্রেতাকে কিনতে হয় ত্রিশ ডলার দিয়ে। অর্থাৎ ২৫ ডলার পাচ্ছেন শুধু দোকানী। তথ্য প্রযুক্তি যেরকম "অফিস" নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ঢেলে সাজাচ্ছে, তেমনি "দোকান" নামক প্রতিষ্ঠানটিকেও ধাক্কা দিয়েছে। ই-কমার্স বা ইলেকট্রনিক কমার্স "দোকানের" প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে দিচ্ছে। ই-কমার্সের মাধ্যমে একই জামা ৩০ ডলারের পরিবর্তে এখন ২০ ডলারে বিক্রী করা সম্ভব হচ্ছে। ক্রেতা বাড়ীতে বসেই কেনাকাটা করতে পারছেন। জামা কম্প্যুটারের পর্দায় পছন্দ করছেন। বাড়ীতে পৌঁছে দিচ্ছে বিক্রেতা। জামার গুদাম থাকছে শহর থেকে দূরে। এতে বাংলাদেশী সরবরাহকারীর কি ফায়দা হলো ? ফায়দা হলো এই : বাংলাদেশী প্রস্তুতকারী সরাসরি আমেরিকান ভোক্তার কাছে জামা বিক্রী করতে পারবেন। আমেরিকাতে শুধু তাঁর গুদাম থাকলেই হলো।

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে কম বেতনের দেশগুলিতে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়ে পড়বে এমন সব কাজ যেগুলি রুটিনমাপা একঘেঁয়ে কাজ, বেশী মাথা খাটাতে হয় না। যেমন: সিকিউরিটি সার্ভিস। উন্নত দেশে বাড়ীঘরের নিরাপত্তার ব্যাপারে দেখাশোনার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান আছে। তাদের একটা কাজ হলো সিকিউরিটি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটরে সব সময় নজর রাখা -- অবাঞ্চিত কেউ বাড়ীর আশেপাশে আসছে কিনা। যদি কেউ আসে, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিশকে কিংবা অন্য কোন সার্ভিসকে ফোনে সেটা জানিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে। এই কাজের জন্য মনিটরকে সামনে রেখে কিছু লোককে বসে থাকতে হচ্ছে দিন রাত। যদি কখনো কিছু অঘটন ঘটে তার প্রতি নজর রাখার জন্য। অথচ এরকম ঘটনা হয়তো কখনো ঘটছেই না। কিন্তু জিরান দেবার উপায় নেই। উন্নত দেশে মানুষের মোটা বেতনের কারণে এটা খুবই ব্যয়বহুল। তথ্য প্রযুক্তির বদৌলতে এই মনিটর আমেরিকা ইউরোপের কোন শহরে না-বসিয়ে এটা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে বসালেই হয়ে যায়। দিন রাত ২৪ ঘন্টা নিবিষ্ট মনে আমরা আমেরিকা ইউরোপের অফিস, দোকান, কারখানা, মূল্যবান সম্পত্তি, মূল্যবান স্থাপনা পাহারা দেবো, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবো।

টেলিফোনের জবাব দেয়া (answering service) আরেকটি কাজ, যেটা উন্নত দেশগুলি থেকে কম বেতনের দেশগুলির দিকে চলে আসছে। এর সঙ্গে আসছে টেলিফোনে টাকা পরিশোধের তাগিদ দেয়া, বিভিন্ন পণ্য বাজারজাত করণের টেলিফোনভিত্তিক প্রচার, এধরণের আরো অনেক কাজ।

ই-কমার্স খুব পরিচিত হয়ে গেছে পাশ্চাতের দেশগুলিতে। ই-কমার্সের মারফৎ আমরাও আমাদের নানা পণ্য সরাসরি পাশ্চাত্যের ক্রেতাদের কাছে বিক্রী করতে পারবো। আমাদের জন্য এখনই যেটা সবচাইতে আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠছে সেটা হলো ই-সার্ভিস (অর্থাৎ ইলেকট্রনিক সার্ভিস)। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের সেবা নিয়ে যাবো পাশ্চাত্যের কাছে।

অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক আদল বদলে যাচ্ছে

তথ্য প্রযুক্তির দ্বিতীয় চমৎকার বিষয়টি হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তথ্য প্রযুক্তি পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল একের কথা বহুজনের কাছে পেঁৗছে দেবার মাধ্যমে। এতেই পুরোনো সমাজের ভিত নড়ে গিয়েছিল। বই (মুদ্রন শিল্প), সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এক নতুন সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করেছে। এই প্রযুক্তির মূল বিষয়টি হলো একজনের কথা বহুজনকে শোনানোর, দেখানোর ব্যবস্থা। কিন্তু এই প্রযুক্তিতে বিরাট একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। একের কথা বহুজনকে শোনানো যায় একতরফাভাবে। একতরফাভাবটা কাটানোর নানা চেষ্টা হয়েছে --- সংবাদপত্রে পাঠকের চিঠি, রেডিও-টেলিভিশানে পধষষ-রহ প্রোগ্রাম ইত্যাদি। কিন্তু বরাবর কর্তৃত্ব রয়ে গেছে একদিকে। যেদিকে থাকছে একজনের কণ্ঠ, কর্তৃত্ব সেদিকে। নিয়ন্ত্রণ তার হাতে। নতুন তথ্য প্রযুক্তি এটা চূড়ান্তভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে। এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন আরেকজনের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে যোগাযোগ করতে সক্ষম --- দু'জনের হাতেই একই পরিমাণ ক্ষমতা। তার সঙ্গে আরেকটা সুবিধা যুক্ত হলো দু'জনের যে

কেউ দুনিয়ার যেকোন জায়গাতেই থাকুন, তাৎক্ষণিকভাবে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব। চিন্তা করুন শেরশাহের ঘোড়ার ডাকের প্রচলন থেকে আমরা কোথায় চলে এসেছি। খামে আঠা লাগিয়ে খাম বন্ধ করে জামাটা গায়ে দিয়ে ডাক বাক্সে চিঠি ফেলতে যাওয়া -- এখনই প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা বলে মনে হয়।

নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন খোল-নলচে বদলে যাচ্ছে, রাজনীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের ভিত রচনা করছে, যার কারণে একের সঙ্গে একের যোগাযোগই শুধু হচ্ছে না --- সেটা হতে পারছে কারো মধ্যস্ততা ছাড়াই। দশজনের হাত গড়িয়ে পণ্যকে এখন ক্রেতার কাছে পৌঁছাতে হবে না। খবর দশ হাত ঘুরে আসতে হবে না আর। একজনের খবর পাঁচজনের হাত হয়ে আনতে গেলেই বিপদ। মাঝখানে খবরের বিকৃতি ঘটবেই। যার হাত দিয়ে খবর আসে সে ফায়দা নেবেই। এখন যাকে নিয়ে ঘটনা তার সঙ্গে সরাসরি আলাপ করতে পারবেন। তার ভাষ্যে সেটা জানতে পারবেন। আমেরিকায় ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও (NPR) নেটওয়ার্কে কিছুদিন আগে আমার একটা ইন্টারভিউ হচ্ছিল। ইন্টারভিউকারী মহিলা সাংবাদিক এক পর্যায়ে আমাকে পল্লীফোনের সার্ভিস বিক্রীকারী মহিলা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। গ্রামের অশিক্ষিত মহিলা টেলিফোন ব্যবহার করতে ভয় পান কিনা, পুরুষরা এতে বাধা দিচ্ছে কিনা, যে টাকা ঋণ নিয়ে তিনি এই ব্যবসায় নেমেছেন তাতে এমন আয় হচ্ছে কিনা যাতে করে তিনি স্বচ্ছন্দে ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারছেন ইত্যাদি। প্রথম কয়েকটা প্রশ্নের জবার দেবার পরে আমি ইন্টারভিউকারীকে বললাম : এসব প্রশ্ন আমাকে না-করে যিনি এই ব্যবসা করছেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে অনেক সঠিক জবাব পাবেন। তিনি বল্লেন, আমি কি তাঁকে ইন্টারভিউ করতে পারবো ? আমি বল্লাম, অবশ্যই পারবেন। তাঁর টেলিফোন আছে। তাঁকে ফোন করুন। সেই ইন্টারভিউ “লাইভ” প্রোগ্রাম হিসেবে প্রচার করুন। তিনি কথাটা শুনে প্রথমে অবাক হলেও পরে বুঝলেন যে এটা একটা চমৎকার প্রোগ্রাম হবে। অবশেষে কয়েকদিন পর বাংলাদেশের গ্রামের টেলিফোন সার্ভিস বিক্রেতা মহিলার টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করে একজন বাংলাদেশীর সহায়তা নিয়ে তিনি ওয়াশিংটন থেকে ইন্টারভিউ করলেন গ্রামের সেই মহিলাকে। সারা আমেরিকায় শ্রোতারা শুনলেন -- তাঁর কণ্ঠে, তাঁর ভাষ্যে। আমার জবাবের চাইতে অনেক বেশী সঠিক, অনেক বেশী আবেদনসৃষ্টিকারী ইন্টারভিউ ছিল সেটা।

একের সঙ্গে একের যোগাযোগে সামাজিক, রাজনৈতিক অনেক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে, কিন্তু অর্থনৈতিক সুবিধাটা কোথায়?

প্রথম কথা, ব্যক্তি হিসেবে আপনি নিজেকে পৃথিবীর সামনে নিজেকে তুলে ধরতে পারছেন। কাউকে মাধ্যম করার প্রয়োজন নেই। মুরুব্বী লাগছে না। মুরুব্বীরা একজনের উপকার করতে গিয়ে হয়তো হাজারজনের ক্ষতি করে ফেলেন, অনায়াসে সমাজের বিরাট ক্ষতি করে ফেলেন। এখন আপনি কারো ক্ষতির কারণ হচ্ছেন না। আপনি যেমন নিজেকে সারা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরছেন তেমনি সারা দুনিয়া নিজেকে আপনার কাছে তুলে ধরতে পারছে। আপনি আপনার অর্থনৈতিক স্বার্থটা সবার সামনে তুলে ধরুন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নিখরচায়। বিশ্বব্যাপী।

বর্তমানে প্রচলিত নিয়মে সরকারকে কোন বিষয়ে সর্বসাধারণকে জানান দিতে হলে সেটা পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞপ্তি আকারে কিংবা সরকারী গেজেটে ছাপাতে হয়। এখন নিয়ম হয়ে যাবে এটা ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করতে হবে। সকল কর্মখালী বিজ্ঞাপন, টেন্ডার নোটিশ, উকিলের নোটিস ওয়েব-সাইটে না-দেয়া পর্যন্ত এটা সবাইকে জানানো হয়েছে বলে গণ্য হবে না। সরকার হোক, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হোক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক, যেকোন প্রতিষ্ঠান হোক, ব্যক্তি হোক, আপনি তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল সংবাদ বিশ্বকে জানাবেন, বিশ্বের সকল সংবাদ সরাসরি সংগ্রহ করবেন, আপনার নিজের জন্য নিজের মাপের “পৃথিবী” নিজে সৃষ্টি করে নেবেন। আপনি কি ঢাকায় আছেন, নাকি প্রত্যন্ত গ্রামে আছেন --- পৃথিবীর কিছু থেকেই আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন না। আপনি নতুন জ্ঞানলাভ করতে চান, করুন। নতুন জ্ঞান সারা বিশ্বে প্রচার করতে চান, করুন। আপনার বিশেষ কোন সার্ভিস কিংবা পণ্য আপনি বিশ্বের বাজারে বাজারজাত করতে চান, করুন। মতামত প্রচার করতে চান, করুন। অনুসন্ধান করতে চান, করুন।

সফটওয়্যার

তথ্য প্রযুক্তি-ভিত্তিক কর্মকান্ডের প্রবৃদ্ধি প্রবল বেগে দুনিয়া ব্যাপী বাড়ছে। এর ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যার চাহিদা আকাশচুম্বী হবে সেটা হলো “সফটওয়্যার” অর্থাৎ তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারভিত্তিক নির্দেশাবলী। প্রতি নিয়ত মানুষ নতুন নতুন কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, তার জন্য কাউকে না কাউকে সেরকম করে “কম্প্যুটার নির্দেশাবলী” প্রস্থত করে দিতে হবে। আগের “নির্দেশাবলী” ব্যবহার করতে গিয়ে আরো নতুন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, নতুন বুদ্ধি আসবে --- আবার নতুন করে “নির্দেশাবলী” পরিমার্জন, সংশোধন করতে হবে।

টাকার অংকে একাজের পরিমাণ বিশাল অংকে দাঁড়ায়। তার ছিঁটেফোটাও যদি বাংলাদেশে আমরা করতে পারি তার পরিমাণ হাজার কোটি টাকার গুণিতকে নির্ধারিত হবে। এবছর আমার ধারণা বাংলাদেশ থেকে ১০০ কোটি টাকার সফটওয়্যার রফতানী হবে। এটা আগামী বছর ৫০০ কোটি টাকাতে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব --- যদি আমরা একাজ করার প্রয়োজনীয় আয়োজনগুলি করে দিতে পারি। ২০১০ সালে অন্ততঃ ১৫ বিলিয়ন ডলার (পৌনে এক লক্ষ কোটি টাকা) মূল্যের সফটওয়্যার রফতানীর জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেয়া উচিত।

সফটওয়্যার তৈরীর জন্য কি বিদেশ থেকে বড় বড় দামী মেশিনপত্র নিয়ে আসতে হবে ? বিরাট বিরাট কারখানা বসাতে হবে ? সুপার ট্যাংকারভরে অফুরন্ত তেল আমদানী করতে হবে ? চট্রগ্রাম বন্দরকে সম্প্রসারিত করে ১০ গুণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে? মোটেই না। এর কিছুই লাগবে না।

মানসিক প্রস্তুতি

তাহলে প্রস্তুতি কিসের ? আমাদের কিসের অভাব যার জন্য বছরে পৌনে ১ লক্ষ কোটি টাকা রোজগারের সুযোগ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে হবে ?

প্রস্তুতি হিসেবে সবার আগে যে-প্রস্তুতির উপর আমি বিশেষ জোর দেবো সেটা হলো মানসিক প্রস্তুতি। এটা সব চাইতে জরুরীভাবে এখন দরকার। আমরা যখন সফটওয়্যার শিল্প নিয়ে আলাপ আলোচনা করি তখন ভাবসাব দেখে মনে হয় এটা চিংড়ী রফতানীর মত আরেকটা বিষয়। যে শিল্পের মারফৎ আমরা আমাদের অর্থনীতিকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে পড়সনধঃ-ভরঃ অবস্থায় নিয়ে আসতে চাই তাকে ত দশ কামের এক কামের কাতারভুক্ত করে রাখলে চলবে না।

আমি যেভাবে সফটওয়্যার শিল্পকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তিশালী ইঞ্জিন হিসেবে কল্পনা করছি আপনি যদি তাতে একমত হন, তবে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে বাংলাদেশের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে "সফটওয়্যার শিল্পের দেশ" হিসেবে। বাংলাদেশ এবং সফটওয়্যার সমার্থক করে ফেলতে হবে আমাদের নিজেদের মনে। তাহলে পৃথিবীর মনেও ক্রমে ক্রমে একই ধারণা আমরা গেঁথে দিতে পারবো। পৃথিবীর কোনো দেশের পরিচয় কফি রফতানীর দেশ হিসেবে, কোনো দেশের পরিচয় ঘড়ি তৈরীর দেশ হিসেবে, কোনো দেশের পরিচয় গাড়ী তৈরীর দেশ হিসেবে --- আমাদের দেশের পরিচয় হবে সফটওয়্যার তৈরীর দেশ হিসেবে। এই পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের প্রমাণ তৈরী করতে হবে প্রতি পদে পদে। দুনিয়ার কোনো কোনো শহর বা এলাকা নিজেদেরকে "সাইবার সিটি", কিংবা "সিলিকোন ভ্যালী" নামে পরিচয় দেয়। আমাদের দেশকে "সাইবার কান্ট্রি" হিসেবে পরিচিত করার জন্য আমাদেরকে সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করতে হবে। আমি এর কোন বিকল্প দেখি না।

সরকারকে বিশ্বাস করতে হবে যে ২০১০ সালের মধ্যে আমরা ১৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের সফটওয়্যার রফতানী করতে পারবো। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেই এই সফটওয়্যার তৈরী করতে হবে। সরকার কোন সফটওয়্যার তৈরী করুক --- এ কথা কেউ বলছে না। সরকারকে এটা করতেও হবে না। সরকারকে শুধু কিছু স্ট্রাটেজিক অনুমতি দিতে হবে --- কিছু তালাবদ্ধ দরজা খুলে দিতে হবে, সফটওয়্যার তৈরী করতে গেলে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার সেগুলির অনুমতি দিতে হবে। আর ওহঃবষষবপঃঁধষ চৎড়ঢ়বৎঃু জরমযঃ আইনটি তৈরী করে দিতে হবে। (এই আইন মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়ে গেছে। শুধু সংসদে যাবার অপেক্ষা।) বাকী সব কিছু বেসরকারী খাতই করবে। সরকার তাদের উৎসাহ যোগাবেন, তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে নিজেকে উৎসর্গিত করবেন, বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজকর্ম করার জন্য, লেনদেন করার জন্য যেধরণের আইন, কর্মপদ্ধতি, পরিবেশ দরকার সেটুকু নিশ্চিত করবেন --- এটুকুই শুধু চাওয়া।

তাঁরা কি এযুগে এগ্রহে বাস করেন ?

তথ্য প্রযুক্তির যে-মহোৎসব আমেরিকায় শুরু হয়েছে তা ছড়িয়ে পড়েছে নানা দেশে। পাশের দেশ ভারতও যোগ দিয়েছে এই মহোৎসবে। বাংলাদেশ এখনো জানালার ধারে বসে আছে। খুব একটা মনোযোগ দিয়ে মহোৎসবটি খেয়াল করছে বলেও মনে হচ্ছে না। অথচ এই মহোৎসবে যোগ দেবার আবশ্যিকতা আমাদের খুবই বেশী। যোগ দেবার আগ্রহ সৃষ্টি না-হবার একটা বড় কারণ হয়তো সরকারের ভেতর এ শিল্প সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট না-থাকা। সরকারী কর্মকর্তারা, রাজনৈতিক নেতারা এটার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত নন বলে তথ্য প্রযুক্তি যে-যে পথে ঢুকতে পারে সেসব পথে বড় বড় তালা লাগিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্তে বসে আছেন। তাঁরা এই তালাগুলি লাগানোর ব্যাপারে হাস্যকর সব যুক্তি দেখান। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ নেই এরকম দেশের উদাহরণ টেনে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার সাফাই গান। তাঁদের কর্মকান্ড দেখলে মনে হয় না তাঁরা এযুগে, এগ্রহে বাস করেন। পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে বলে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, কাজের ধরণ-ধারণ ক্রমে আরো বেশী সুদূর অতীতের কান্ডের মত মনে হচ্ছে। যে-কাজ পাঁচ মিনিটে করে দেয়া যায় তার জন্য পাঁচ মাস আপনাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাচ্ছেন। পৃথিবী যখন তাৎক্ষণিক যোগাযোগ, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত, কাগজহীন অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের কর্মকর্তারা ছোট্ট একটা "অনাপত্তি" জ্ঞাপন করার আগে ফাইলে দিস্তার পর দিস্তা কাগজ জমা করছেন, তিন মন্ত্রণালয়ের চৌদ্দ হাত ঘুরাচ্ছেন সতেরো মাস সময় নিয়ে। অপেক্ষার বৈঠকখানা থেকে বিরক্ত হয়ে কখন আমাদের ভবিষ্যৎ বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে সেটা দেখার দায়িত্ব তাঁরা বোধ করেন না।

বাংলাদেশ সরকার আশির দশকে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। এই ভয়ানক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমাদের বহুদিন সময় লাগবে। এই সিদ্ধান্ত আমাদেরকে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্ততঃ দুই যুগ পিছিয়ে দিয়েছে। বারবার

অনুরোধ জানানো সত্বেও সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে যাওয়া আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সঙ্গে বাংলাদেশ নিজেদের যুক্ত করতে রাজী হয়নি। এশিয়ান রেলওয়ে বাংলাদেশের কোন দিক দিয়ে ঢুকবে, কোন দিক দিয়ে বের হবে এটা নিয়ে আমরা খবরের কাগজে বিতর্ক পড়ি, কিন্তু তথ্য প্রযুক্তির অতি-মহাসড়ক (information super highway) আমাদের দেশে বারবার ঢোকার অনুমতি চেয়েও অনুমতি পায়নি। এর কোনো ব্যাখ্যা সরকার কারো কাছে কখনো দিয়েছেন কিনা জানি না। কারো কাছে শুনেছি বাংলাদেশের জন্য এটা একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস মনে করে সরকার এটা পাত্তা দেয়নি, কারো কাছে শুনেছি, এতে যা-টাকা লাগবে সে টাকার অনুপাতে ফায়দা পাওয়া যবেনা বলে সরকার এতে আগ্রহ দেখায়নি। কারো কাছে শুনেছি, এতে সরকারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত(!) হবে বলে সরকার এর থেকে দূরে থেকেছে। বাংলাদেশ রাজী না-হওয়াতে তথ্য প্রযুক্তির এই অতি-মহাসড়ক সিংগাপুর, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান হয়ে আমেরিকার দিকে চলে গেছে। বাংলাদেশকে স্পর্শ না-করে। এর ফলে এখন বাংলাদেশকে স্যাটেলাইট দিয়ে সিংগাপুর, হংকং গিয়ে অতি-মহাসড়কে উঠতে হচ্ছে। এতে বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশ হয়ে রইলো। যেদেশ নিজেকে দুনিয়ার সামনে "Producer of Softwares for the World" বলে পরিচিত করতে চাইছে তথ্য প্রযুক্তির অতি মহাসড়ক সেদেশের ত্রিসীমানা দিয়ে যায়নি, এটা একেবারে অকল্পনীয় কথা।

ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশে দেশজুড়ে উ”চ-গতি সম্পন্ন ফাইবার-অপটিক ব্যাকবোন (প্রধান সড়ক) আছে এবং তা আন্তঃ-মহাদেশীয় অতি-মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত। ফলে দেশের যেকোনো জায়গায় তথ্য প্রযুক্তি শিল্প সহজে গড়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশে অন্য এক কারণে ১৫ বছর আগে থেকে উ”চ গতি সম্পন্ন ফাইবার-অপটিক ব্যাকবোন তৈরী হয়ে আছে। এটা তৈরী হয়েছিল বাংলাদেশ রেলওয়ের সিগনালিং ব্যবস্থার জন্য। রেলপথের প্রায় সকল স্টেশন এই ফাইবার-অপটিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। এই নেটওয়ার্কের যে-ক্ষমতা রেলওয়ে তার ৮ শতাংশের বেশী কোনদিন ব্যবহার করতে পারেনি। এই নেটওয়ার্ক কণ্ঠ-যোগাযোগ এবং তথ্য আদানপ্রদানের জন্য একটা চমৎকার ব্যাকবোন হিসেবে কাজ করতে পারে। টেলিফোন সার্ভিস, ইন্টারনেট সার্ভিস এই ব্যাকবোনের মাধ্যমে সারাদেশে অনায়াসে সম্প্রসারণ করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই নেটওয়ার্ককে টেলিফোন সার্ভিস বা ইন্টারনেট সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করতে দিতে সম্পূর্ণ নারাজ।

বাংলাদেশে ইন্টারনেট সার্ভিস যাঁরা দিচ্ছেন তারা যেহেতু সরাসরি তথ্য প্রযুক্তির অতিমহাসড়কে উঠতে পারছেন না তারা VSAT-এর মাধ্যমে স্যাটেলাইট দিয়ে সিংগাপুর বা হংকং-এ অতিমহাসড়কে উঠছেন। স্যাটেলাইট ব্যবহার করতে গেলেই খরচ বাড়ে। তার উপর বাংলাদেশ সরকার VSAT ভাড়া দিচ্ছেন চড়া দামে । তাঁরা 64 KBPS ক্ষমতাসম্পন্ন একটি VSAT এর জন্য মাসে চার লক্ষ টাকা ভাড়া নেন। ভারতে ভাড়া এর ১২.৫ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার আটগুণ বেশী ভাড়া নিচ্ছেন। বাংলাদেশের একই টাকায় আমেরিকায় ২৪ গুণ বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন VSAT ভাড়া করা যাবে।

যেভাবেই হোক আমাদেরকে অতি-মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। এর দু'টি বিকল্প আছে ঃ

(ক) ভারতের জাতীয় প্রধান তথ্য সড়কের সঙ্গে আমাদের ফাইবার-অপটিক ব্যাকবোনের সংযোগ করে দিয়ে এটা সম্ভব হয়। শুনেছি ভারতের জাতীয় প্রধান তথ্য-সড়ক কলকাতায় তার একটি সংযোগস্থল (hub) স্থাপন করবে। তখন একাজটা খুব সহজে করা যাবে। আমাদের জাতীয় ফাইবার-অপটিক ব্যাকবোন-এর সঙ্গে কলকাতায় অতি-মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হবে।

(খ) এখন শুনছি সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে যাওয়া আন্তঃ-মহাদেশীয় আরেকটি অতি মহাসড়কে যোগ দেবার জন্য বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর জন্য বাংলাদেশকে ৪০ মিলিয়ন ডলার দিতে হবে। এটা যদি সত্য হয় বাংলাদেশের কিছুতেই উচিত হবে না এই সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। সরকার যদি এই টাকা বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত না-থাকে তবে বেসরকারী উদ্যোগেও এই বিনিয়োগ সম্ভব --- যদি সরকার এই অতি মহাসড়ক ব্যবহারের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ না-করেন।

তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের ব্যাপারে সরকারের বিরূপ ভূমিকা কিংবা অনাগ্রহের আরেকটি নমুনা হলো দেশে ইন্টারনেট চালু করার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে অনুমতি না-দেয়া। অবশেষে মাত্র ১৯৯৬ সালে তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই অনুমতি দেয়া হয়। এর আগে সরকার ভাব দেখাতেন ইন্টারনেট চালু হলে অথবা VSAT বেসরকারী ব্যবহারে দিলে দেশের সব গোপন তথ্য পাচার হয়ে যাবে। এজন্য এসবে তালা লাগিয়ে রেখেছিলেন। (বেশী দিন আগের কথা নয় --- সরকার নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে কম্প্যুটার কেনার আগে নানা তথ্য দিয়ে সরকারের অনুমতির জন্য দরখাস্ত করতে হবে!)

সরকার নামক প্রতিষ্ঠানকে বুঝতে আমার খুব কষ্ট হয়। ঔপনৈবেশিক সরকার হলে আমার বলার কিছু থাকতো না। স্থানীয় মানুষের মতলব সম্বন্ধে তাদের একটা সন্দেহ থাকতে পারতো। কিংবা স্থানীয় মানুষের ভালোর ব্যাপারে তাদের আগ্রহ না-ও থাকতে পারতো। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার দেশের মানুষের ন্যায্য পাওনা বুঝতে চাইবে না, দেশের মানুষ সবাই মিলে যে সহজ কথাগুলি বুঝে সেটা সরকার বুঝবে না, সরকারকে বুঝাতে বছরের পর বছর মানুষকে সরকারী কর্তাদের অফিসে এবং বাড়ী বাড়ী ধর্ণা দিতে হবে, কাঠখড় পোড়াতে হবে, সম্মেলন করে প্রধান অতিথি করে বুঝাতে হবে; এটা কেমনতরো সরকার-ব্যবস্থা! সরকার নামক পুরো প্রতিষ্ঠানটির ভেতর আমি গণতান্ত্রিকতার ছোঁয়া পাই না। বিপুলভাবে পাই রাজতান্ত্রিকতার উন্নাসিকতা, আর মানুষের প্রতি অবজ্ঞা।

বিল গেইটসের সম্পদ বাংলাদেশের জিডিপি-র আড়াইগুণ !

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে নতুন তথ্য-প্রযুক্তি সম্বন্ধে একটা বড় ভয়ের বিষয় হলো এতে ধনী দেশ ধনী ব্যক্তি বিপুলভাবে সম্পদশালী হয়ে উঠবে। বর্তমান পৃথিবীতে ২২৫ জন শীর্ষ ধনী ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ পৃথিবীর অর্ধেক লোকের বার্ষিক আয়ের সমান। ১৯৬৫ সালে চীনের বার্ষিক অভ্যন্তরীন উৎপাদনের সমপরিমাণ সম্পদ ছিল দশ হাজার শীর্ষ ধনী ব্যক্তির। ইতিমধ্যে চীনের বহু উন্নতি হওয়া সত্বেও আজকের চীনের বার্ষিক অভ্যন্তরীন উৎপাদনের সমান সম্পদ আছে মাত্র ৮৪ জন শীর্ষ সম্পদশীল ব্যক্তির কাছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৪৮টি সর্বনিম্ন উন্নয়নশীল দেশের (least developed countries) বার্ষিক অভ্যন্তরীন উৎপাদনের সমপরিমাণ সম্পদ আছে মাত্র তিনজন শীর্ষ সম্পদশালী ব্যক্তির কাছে। মাইক্রোসফট-এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেইটসের বর্তমান সম্পদ বাংলাদেশের বার্ষিক অভ্যন্তরীন উৎপাদনের আড়াইগুণ !

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে তথ্য-প্রযুক্তির বাণিজ্যিক সুফল বিপুলভাবে ধাওয়া করছে সম্পদশালী দেশ এবং সম্পদশালী ব্যক্তির দিকে। বিপুল অর্থের বিনিয়োগের মাধ্যমে তারা তথ্য-প্রযুক্তিকে তাদেরই প্রয়োজনের মাপে ঢালাই করে নিতে পারছে। এই প্রযুক্তি হয়ে পড়ছে তাদেরই হাতের আলাদীনের প্রদীপ।

ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবসায়

যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য-প্রযুক্তি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫ থেকে ৯৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার এক তৃতীয়াংশ এসেছে তথ্য প্রযুক্তি থেকে। কম্প্যুটার ও কম্প্যুটারের সঙ্গে সম্পর্কিত জিনিসপত্রের উৎপাদন গাড়ী-শিল্পের মোট উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৯৫ থেকে ৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল ১.৩ বিলিয়ন ডলার। ২০০৩ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৬১৭ বিলিয়ন ডলার। প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তির সঙ্গে ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ধরলে এটা আরো বিরাট অংকে দাঁড়াবে। শুধু কম্প্যুটার, বই, গানের ডিস্ক এবং জামাকাপড় বাবদ ইন্টারনেট ভিত্তিক ইলেকট্রনিক কমার্সের (ই-কমার্স) মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে ক্রেতারা ব্যয় করেছে ১০ বিলিয়ন ডলার। ২০০৩ সালের মধ্যে এটা ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। গোল্ডম্যান স্যাক্সের তথ্যানুসারে আমেরিকায় ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার মূল্য ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এপ্রিল, ৯৯ তারিখের মধ্যে ৪৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উন্নত দেশে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবসা যত বাড়ছে ততই কিছু কিছু কাজ অন্য উন্নত দেশে এবং উন্নয়নশীল দেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য। ১৯৯৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪০ বিলিয়ন ডলার। ২০০৩ সালে এটার পরিমাণ দাঁড়াবে ১০৩ বিলিয়ন ডলার।

শুধু ইন্টারনেটভিত্তিক অফিস সার্ভিস, যার মধ্যে সফটওয়্যার তৈরীর কাজ অন্তর্ভূক্ত নয়, যা এশিয়ান দেশসমূহে স্থানান্তরিত হয়েছে তার পরিমাণ ৯৮ সালে ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। এরই পরিমাণ ২০১০ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ১৮০ বিলিয়ন ডলার। এগুলি এখন প্রধানতঃ যাচ্ছে ভারত, ফিলিপাইন, হংকং এবং সিংগাপুরে। এর বড় একটা অংশ বাংলাদেশে অনায়াসে আসতে পারে। এরমধ্যে রয়েছে কাস্টমার সার্ভিস (৪২ বিলিয়ন ডলার), মানব-সম্পদ সার্ভিস (৫০ বিলিয়ন), ড্যাটা ব্যবস্থাপনা (২০ বিলিয়ন), হিসাব-রক্ষণ সার্ভিস (২০ বিলিয়ন), দূর শিক্ষণ (১৯ বিলিয়ন), নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা (৮ বিলিয়ন), ওয়েব-সাইট সার্ভিস (৭ বিলিয়ন), ইঞ্জিনীয়ারিং ডিজাইন (৬ বিলিয়ন), অনুবাদ, ট্রান্সক্রিপশান, স্থানীয় রূপান্তর (১ বিলিয়ন)। সব মিলিয়ে ১৮০ বিলিয়ন ডলার। বলুন, এর মধ্য থেকে বাংলাদেশ কি ২০১০ সালে ৫ বিলিয়ন ডলারের কাজ নিয়ে আসারও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না?

বাংলাদেশ যদি এই যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয় তবে কার দোষে ব্যর্থ হবে ? দেশে একাজ করে দেয়ার জন্য উপযুক্ত লোকের অভাবের কারণে ? নাকি, বেসরকারী খাতে একাজের জন্য উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসবে না বলে ? নাকি, দেশে তথ্য প্রযুক্তির জন্য প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাবে ? নাকি, দেশে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অনুকূল পরিবেশ না-থাকার কারণে ? এর প্রত্যেকটা কারণের ওজন নির্ধারণ করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা আজ থেকে নেয়া শুরু করতে হবে।

ইন্টারনেট সংযোগ

পৃথিবীতে ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা বিদ্যুৎ গতিতে বাড়ছে। যে গতিতে এটা বাড়ছে এই বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে ২০০৩ সালে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার অর্ধেকের ইন্টারনেট ঠিকানা হয়ে যাবে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশে কতজনের ইন্টারনেট ঠিকানা হবে ?

১৯৯৮ সালে সারা এশিয়াতে ইন্টারনেট সংযোগের সংখ্যা ছিল ১৫ মিলিয়ন। ২০০৩ সালে এর সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৪ মিলিয়ন। ১৯৯৭ থেকে ৯৮ সালে ভারতে একবছরে দেড় লক্ষ সংযোগ থেকে বেড়ে ৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। ২০০০ সালে এই সংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন এবং ২০০৩ সালে ৯ মিলিয়নে দাঁড়াবে।

আমার আন্দাজ বাংলাদেশে এখন ত্রিশ হাজার ইন্টারনেট সংযোগ আছে। ২০০৩ সালে এটা অনায়াসে ১ মিলিয়নে যেতে পারে। এর জন্য দরকার ঃ টেলিফোন লাইন বৃদ্ধি, ফাইবার-অপটিক ব্যাকবোন ব্যবহার করার উপর বিধিনিষেধ তুলে নেয়া, ইন্টারনেট ব্যবহারের ফি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা। মিনিট ভিত্তিক ফি ধার্য করার পদ্ধতির পাশাপাশি মাসিক ভিত্তিতে ফি ধার্য করার পদ্ধতি চালু করা গেলে ইন্টারনেটের ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। তখন স্কুল, কলেজ, বাজার, অফিস, আদালত, যেখানে যেখানে মানুষ জমায়েত হয় এমন সব জায়গায় ভাড়ায় ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা সম্ভব হবে।

টেলিফোন সমস্যা

বাংলাদেশে টেলিফোন সমস্যার সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হবে। এখন সারাদেশে মোট টেলিফোনের সংখ্যা ০.৫ মিলিয়ন। তার মধ্যে (সরকারী সংস্থার) তার-ভিত্তিক টেলিফোন সাড়ে ৪ লক্ষ, আর মোবাইল ফোন ১ লক্ষ। ২০০৩ সালের মধ্যে ১ মিলিয়ন ইন্টারনেট সংযোগ দিতে হলে দেশে অন্ততঃ ২ মিলিয়ন টেলিফোন সংযোগ চালু থাকতে হবে। টেলিফোনের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ একবারে তলায়। এখন দেশের ২৫০ জনের জন্য একটা টেলিফোন। ২০১০ সালের মধ্যে টেলিফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমসে কম ৫ মিলিয়নে বৃদ্ধি করা উচিত। তখন ১০০ জন মানুষের জন্য ৩.৩ টি ফোন হবে। বাংলাদেশকে হেঁচকা-টানে অর্থনীতির গহ্বর থেকে তুলতে হলে সারাদেশ টেলিফোন দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তির প্রধান বাহনই হলো টেলিফোন। যতদিন টেলিফোন সরকারের বন্দীশালায় থাকবে ততদিন তথ্য প্রযুক্তির বন্দীদশা ঘুচবে না। আর টেলিফোন এমন এক জিনিস এতে বেসরকারী বিনিয়োগকারী সাগ্রহে এগিয়ে আসে। সরকারকে একাজে কোন টাকা বিনিয়োগ করতে হয় না। তথ্য প্রযুক্তিই যদি আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির পথ হয় তবে টেলিফোনকে আমরা বন্দীশালা থেকে মুক্ত করছি না কোন যুক্তিতে? সরকার বাণিজ্যিকভাবে তার-ভিত্তিক টেলিফোন সার্ভিস যদি চালাতে চায় চালাক। সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী প্রতিযোগীদের জন্যও তার-ভিত্তিক টেলিফোন সার্ভিস দেবার রাস্তা খুলে দিক। টেলিফোন সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা দেয়া, প্রতিযোগীদেরকে নীতিনিয়ম পালনে বাধ্য করা, ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে শুনেছি। এটা শুভ সংবাদ। আশা করি এই সংস্থা টেলিফোন সার্ভিসকে মুক্ত করে বিপুল বেগে টেলিফোন সংখ্যা বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান হবে তথ্য-প্রযুক্তি দিয়ে

অনেকের ধারণা তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প স্থাপন করলে শুধু প্রোগ্রামার-ইঞ্জিনীয়ারদের সুবিধা হবে। সাধারণ লোকের এখানে কোন কর্মসংস্থান নেই। এখানে কল চালাবার মত শ্রমিক লাগবে না, ট্রাকে করে মাল আনানেওয়া দরকার হবে না, হেঁইও-হেঁইও করে মাল ওঠা-নামা করতে হবে না। শুধু টেলিফোনে টেলিফোনে কাজ শেষ।

উপরের বর্ণনাটি সঠিক। কিন্তু উপসংহারটি সঠিক নয়। সফটওয়্যার শিল্পে বিশেষজ্ঞের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু শুধু বিশেষজ্ঞ দিয়ে একাজ হয় না। বিশেষজ্ঞ লাগে মূল ডিজাইন রচনার জন্য। খবরদারী করার জন্য। দালান বানানোর মত। মেশিন বানানোর মত। কিন্তু অন্য সব কিছুর মত সফটওয়্যার শিল্পেও বহু মানুষ লাগে নানা স্তরে কাজ করার জন্য। একেবারে নীচের সারির কর্মী যারা তারা একেবারে সাধারণ শ্রমিকের মত। গৎবাঁধা কাজ পুনঃ পুনঃ করে যাওয়াই তাদের কাজ।

তাছাড়া তথ্য প্রযুক্তির পুরো জিনিসটা শুধু সফটওয়্যার নয়। সফটওয়্যার একটা অংশ মাত্র। অন্যান্য কাজ বিপুল পরিমাণে শ্রম নির্ভর। পুরো ই-সার্ভিসটাই (E-Service) ভীষণরকম শ্রম নির্ভর। এর মধ্যে আছে ড্যাটা এন্ট্রি, ডাটা ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং, মনিটরিং সুপারভিশন, অ্যাকাউন্টিং সার্ভিস, টেলিফোনে প্রশ্নের জবাব দেয়া, নিরাপত্তা সার্ভিস, ওয়েব-পেজ সার্ভিস, বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন: বিয়ের অনুষ্ঠান, সম্মেলন, প্রকাশনা ইত্যাদি) পরামর্শ প্রদান, যেকোন বিষয়ে শিক্ষাদান, ইঞ্জিনীয়ারিং ডিজাইনকে ডিজিটালাইজ করা ইত্যাদি হাজার রকমের কাজ।

বুদ্ধির বাজারে আমরা আকর্ষণীয় হতে পারি

তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ অন্যান্য সকল প্রযুক্তিকেও দ্রুতগতিতে পরিবর্তন করতে থাকবে। ফলে বিশ্বের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি অচিন্ত্যনীয় গতিতে অগ্রসর হবে। বিশ্বের দীর্ঘ মেয়াদী প্রবৃদ্ধি গড়ে ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এখন বিশ্বের বার্ষিক মোট উৎপাদন ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার। যার মধ্যে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হলো এক পঞ্চমাংশ। ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলে প্রথম বছরে বাড়তি উৎপাদনের পরিমানই হবে ২ ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের! পৃথিবীর যেসব দেশের মাথাপিছু আয় ৭৫০ ডলারের নীচে (এর মধ্যে চীন, ভারতও রয়েছে) সেরকম সব ক'টি দেশের বার্ষিক সম্মিলিত অভ্যন্তরীন উৎপাদনের মোট পরিমাণই ২ ট্রিলিয়ন ডলারের কম। যাদের সম্পদের পাহাড় যত বড় সামান্য হারে বৃদ্ধি পেলেই সেটা বিশালায়তন পাহাড়ে পরিণত হবে। চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে বলে সেটা বিরাট পর্বতে পরিণত হতে বেশী সময় লাগবে না।

প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখার জন্য সম্পদশালীরা সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের উৎপাদন সম্প্রসারণ করতে বাধ্য হবে। তাদের কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হবে কে কত নির্ঝঞ্ঝাটে অতি উ"চমানের কাজ সমাধা করে দিতে পারে। তাদের কাছে সব চাইতে আকর্ষণীয় এবং দামী বস্থ হবে "নতুন বুদ্ধি"। যারা নতুন বুদ্ধির যোগান দিতে পারবে তাদের অতি আদরের সীমা থাকবে না। তারা নিজেরাই ব্যবসার অংশীদার হয়ে সম্পদের মালিক হতে থাকবে। বুদ্ধির বাজারে আমরা নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন হতে হবে যেটা শিক্ষার্থীকে নিজের বুদ্ধি শানিত করার সুযোগ দেবে, বিশ্বের জ্ঞানের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে দেবে এবং তার রসাস্বাদনের উপযুক্ত করে দেবে, কল্পনাশক্তিকে পাখা মেলে বিচরণ করার সুযোগ দেবে, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের যেকোন স্থানে যেকোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক আদানপ্রদানের আয়োজন করে দেবে।

চাহিদামাত্র শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি এমন ভূমিকা নিয়ে আসতে পারে যেটা এতদিনকার শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলবে। অশিক্ষা দূরীকরণে তথ্য প্রযুক্তি নতুন চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে। "অশিক্ষিত" শব্দটার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আর মনে হবে না। সাধারণতঃ লিখতে না-জানলে এবং পড়তে না-জানলে আমরা একজন মানুষকে অশিক্ষিত বলি। কিন্তু শিগগিরই এমন ব্যবস্থা আসছে একটি কম্প্যুটার সঙ্গে থাকলে একজন ব্যক্তি লিখতে না-পারা এবং পড়তে না-পারার ঘাটতি সহজে পূরণ করে ফেলতে পারবেন। তিনি যা মুখে বলবেন কম্প্যুটার সাথে সাথে তা লেখার হরফে মনিটরে তুলে ধরবে। অন্য কেউ কোন চিঠি বা লিখিত কোন বক্তব্য কম্প্যুটারে পাঠালে কম্প্যুটার তা শব্দ করে পড়ে শুনিয়ে দেবে।

শুধু তাই নয়, কম্প্যুটারকে মুখের হুকুম দিয়ে তিনি সব কাজ করাতে পারবেন --- যেকাজ শিক্ষিত ব্যক্তি কী-বোর্ড টিপে করছে। এরকম একটা কম্প্যুটার সঙ্গে থাকলে শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না। সবার জন্য কম্প্যুটার হয়ে দাঁড়ায় একজন সার্বক্ষণিক বন্ধু, শিক্ষক, উপদেষ্টা, লাইব্রেরী, তথ্যভান্ডার, সচিব, পত্রলেখক --- একরকম আলাদীনের প্রদীপ, যা টিপলেই দৈত্য হাজির হয় একেক ভূমিকায় । এখন আমাদের স্থির করতে হবে এই দৈত্যকে দিয়ে কি কাজ করাবো।

এরকম একটা কম্প্যুটারকে কাজে লাগালে একজন অশিক্ষিত লোককে লেখাপড়া শিখিয়ে দিতে বেশীক্ষণ সময় লাগার কথা নয়। এর পর ধাপে ধাপে তিনি যা জানতে চান, বা তাঁর যা জানা দরকার তাঁকে তা জানাতে থাকলে তিনি স্কুল কলেজে পড়া ব্যক্তির চাইতে কোন অংশে কম শিক্ষিত হবেন না।

বলতে পারেন গরীব লোক ত এই কম্প্যুটারের নাগাল পাবে না। না, সেটা সত্যি নয়। গরীব লোকও এই কম্প্যুটারের নাগাল পাবে। গরীব ছাত্ররা যেমন স্কুলের নাগাল পায় --- শুধু নাগাল পায় না, নাগাল পেতে তাদেরকে আইনগতভাবে বাধ্য করা হয়, তেমনিভাবে কম্প্যুটারও গরীব লোকের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা যায়। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বাবদ জাতির যে ব্যয় বরাদ্দ হবে তার মধ্য থেকেই এটা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ই-কমার্স, আর ই-সার্ভিস ত ব্যবসার কারণেই কম্প্যুটারকে গরীব মানুষের কাছে নিয়ে আসবে।

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সহজ হয়ে যাবে। এলাকায় ডাক্তার না-থাকলেও দূরে অবস্থিত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে। স্থানীয় প্যারামেডিকদের সার্বক্ষণিকভাবে দূর থেকে পরামর্শ এবং নির্দেশ দেয়া হবে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ সহজলভ্য হবে। টেলিমেডিসিন এখন স্বাস্থ্যসেবার একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবে গড়ে উঠছে। শুধু দেশের ভেতর নয়, দেশের বাইরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ এর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে টেলিফোন সেবা ছড়িয়ে পড়লে

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রসার সহজ হয়ে যাবে। জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ এবং রোগ বিস্তারের খবরও এর মাধ্যমে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা যাবে।

দারিদ্র নিরসন

মানুষের এমন কোন কাজ নেই যেখানে তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যায় না। তথ্য-প্রযুক্তির কথা মনে হলেই আগে মনে হতো এটা বড়লোকদের জিনিস, বড় ব্যবসায়ীদের জিনিস। এখন এটা গরীব মানুষের কাজে কত কার্যকরভাবে লাগানো যায় সেটা একটু চিন্তা করলেই বের করা যায়। যেমন গ্রামীণ ব্যাংক পল্লীফোন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যাদের ঋণ দিচ্ছে টেলিফোন কেনার জন্য। তাঁরা টেলিফোন কিনে সেটা গ্রামের সবার কাছে ভাড়া দিচ্ছেন। এর মাধ্যমে প্রচুর পয়সা রোজগার করছেন। টেলিফোন ঋণের কিস্তি, টেলিফোনের বিল পরিশোধ করার পরও মাসিক দু'হাজার টাকার উপরে তাঁর মাসিক আয় হচ্ছে। এপর্যন্ত ৮১০ টি গ্রামে ৮১০ জন মহিলাকে টেলিফোন ঋণ দেয়া হয়েছে। এবছর ১৫০০ টি গ্রামে ১৫০০ টি পল্লীফোন চালু হবে। গ্রামীণফোন যদি ফাইবার-অপটিক ব্যাকবোন ব্যবহার করে তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করার সরকারী অনুমতি পেয়ে যায় তাহলে বহু হাজার গ্রামে পল্লীফোন কর্মসূচী নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

গ্রামে ফোন যাবার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সেখানে ইন্টারনেট সার্ভিস নিয়ে যাওয়া। ইন্টারনেট সার্ভিস পৌছলেই ই-কমার্স, ই-সার্ভিস চালু করা যেতে পারবে। পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামীণ কম্যুনিকেশান্স এখন টাংগাইলের মধুপুর বাজারে ই-মেইল ও ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করেছে। এর প্রতি স্থানীয় মানুষ প্রচুর আগ্রহ দেখাচ্ছে। ই-মেইল আদানপ্রদান করে, স্থানীয় যুবকদের কম্প্যুটার ট্রেনিং দিয়ে এই প্রকল্পে আয়ও হচ্ছে ভাল।

বিদ্যুৎ সরবরাহ না-থাকায় অনেক জায়গায় মোবাইল টেলিফোন চালু করা যাচ্ছিলো না। এখন সেখানে গ্রামীণ শক্তি নামক আরেকটি কোম্পানী সৌরশক্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

গ্রামীণ কম্যুনিকেশান্স যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীর (MIT) সঙ্গে নতুন একটা বিষয়ে যৌথভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করছে। MIT-র Media Lab বাংলা ভাষায় কথা-প্রযুক্তিকে (Speech Technolog) কাজে লাগানোর আয়োজন করবে। কম্প্যুটার ব্যবহারকারী বাংলায় কম্প্যুটারে কথা বলবেন। সে কথা মনিটরে বাংলায় লেখা হয়ে ফুটে উঠবে। বাংলায় লেখা কোন চিঠি বা ডক্যুমেন্ট ই-মেইলে আসলে কম্প্যুটার এটা পড়ে শুনিয়ে দেবে। এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা খুব সহজেই সম্ভব হবে।

মজার কথা হলো এর জন্য যে-সফটওয়্যার লাগবে সেটা বাংলাদেশেই তৈরী হবে। এই কাজে এমন সব লোককে কাজে লাগানো হবে যারা কম্প্যুটার বা সফটওয়্যার সম্বন্ধে কিছুই বোঝেন না। এমন কি কিশোর-কিশোরীরাও একাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। শুধু অংশ গ্রহণ করতে পারবে বললে ভুল বলা হবে --- কারণ কিশোর-কিশোরীরাই আসলে এই সফটওয়্যার তৈরীতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

আমরা ইতিমধ্যে গ্রামীণ সফটওয়্যার লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী স্থাপন করেছি। এর মাধ্যমে সফটওয়্যার তৈরীর বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে গরীব পরিবারের লোকজনকে সম্পৃক্ত করার কর্মসূচী নেয়া হবে।

বিশ্ব দারিদ্র নিরসনে আন্তর্জাতিক তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমি একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। এটা হলো এমন একটা আন্তর্জাতিক তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা, যার কাজ হবে, তথ্য প্রযুক্তিকে বিশ্বের দারিদ্র নিরসনে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করা। ইংরেজীতে এর নাম প্রস্তাব করেছি International Centre for Information Technology to Eliminate Global Poverty। এর প্রধান কার্যালয় থাকবে এমন এক শহরে যা তথ্য-প্রযুক্তির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। তবে এটা মূলতঃ হবে বিশ্বের সেরা তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, স্যোশাল ইনভেস্টরস, ফাউন্ডেশানসমূহ, দারিদ্র নিরসনে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, এবং নীতিনির্ধারকদের নিয়ে পৃথিবীব্যাপী একটা তথ্য-প্রযুক্তি গোষ্ঠী। তারা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, ভারচুয়াল সম্মেলন করবেন, সমস্যা বিশ্লেষণ করবেন, সমাধান প্রস্তাব করবেন, পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন, নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবেন, পরস্পরকে উৎসাহিত করবেন। এই বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে আবার উপগোষ্ঠী থাকবে, তাদের দলনেতা থাকবে। মূল লক্ষ্য হবে গরীব মানুষকে তথ্য-প্রযুক্তির সেবা প্রদান করে তাকে দারিদ্রমুক্ত করার পথ বের করা। যেহেতু মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রযুক্তি সম্পদশালীর হুকুমে এবং সম্পদশালীর প্রয়োজনে তৈরী হতে বাধ্য হয় সেখানে গরীব মানুষের প্রয়োজনে প্রযুক্তিকে তৈরীও করা যায় না, কাজেও লাগানো যায় না। যে আন্তর্জাতিক কেন্দ্রটির প্রস্তাব করেছি সে-কেন্দ্রটি এই অভাব পূরণ করার দায়িত্ব নেবে। তথ্য প্রযুক্তিকে গরীবের প্রয়োজনে সৃষ্টি করা এবং গরীবের সেবায় নিয়োজিত করাই হবে এটার লক্ষ্য।

সবচাইতে কঠিন বাধা

২০১০ সালের মধ্যে আমাদের মাথাপিছু আয় অন্ততঃ দ্বিগুণ করা এবং দারিদ্রসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা ২৫ শতাংশে কমিয়ে আনা খুবই ন্যায্য এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা। এনিয়ে বিতর্ক করার খুব একটা সুযোগ নেই। এটার জন্য যে একটা মহা আয়োজন প্রয়োজন সেটা বুঝতেও কারো কষ্ট হবার কথা নয়। সারাদেশকে তার সমস্ত মেধা একত্র করে এই মহা আয়োজনে শরীক হতে হবে। এর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ হতে হবে। জাতির সমগ্র মনোযোগ প্রতিনিয়ত এর প্রতি নিবদ্ধ রাখতে হবে।

২০১০ সালের জন্য নির্ধারিত আমাদের এলক্ষ্য বাস্তবায়িত করার পথে সব চাইতে কঠিন বাধা কি হবে --- এই প্রশ্নের জবাবে দেশের প্রায় সকল মানুষই যে-বিষয়টি পরিস্কারভাবে চিহ্নিত করে দেবেন সেটা হলো আমাদের বর্তমান সংঘাতমুখর রাজনীতি এবং বিধ্বস্তোন্মুখ প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

আমাদের রাজনীতি সুস্থতার সকল লক্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। মাস্তানী, চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস আর মিথ্যাচারকে গঠণতন্ত্রের ছকের মধ্যে ঠেসে দিয়ে এটাকে আমরা "রাজনীতি" বলে চালিয়ে দিচ্ছি। এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি বলে এধরণের "রাজনীতি"-তে আর আঁৎকে উঠছি না। সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতাকে আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে প্রায় মেনে নিয়েছি। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করছি না। সন্ত্রাসই যখন রাজনীতি তখন জবরদস্ত সন্ত্রাসীরা জবরদস্ত রাজনৈতিক নেতার পরিচিতি লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। রাজনীতি করা মানে আইন ভাংগার অধিকার পাওয়া --- এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অপরাধ করার অধিকারও স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে।

সৎ, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, নীতিবান নেতা ও রাজনৈতিক কর্মীরা কি রাজনীতি ছেড়ে অন্য কাজে চলে গেছেন ? না, তা যাননি। তাঁরা অবশ্যই নিজ নিজ দলে আছেন। রাজনীতির নতুন আবহাওয়ায় তাঁরা নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছেন । হয়তো এই আবহাওয়ায় অস্বস্তি বোধ করলেও দলের স্বার্থে সকল কর্মকান্ডে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা পেছনের সারিতে থাকছেন। সংঘর্ষের রাজনীতিতে যাঁরা মাঠে ময়দানে কৃতিত্ব দেখাতে পারছেন তাদের কদর আকাশচুম্বী। তাঁরা সামনের সারি দখল করে রাখছেন। সামনের সারিতে তাঁদের আসন পাকাপোক্ত রাখার তীব্র আকাঙ্খায় তাঁরা সংঘাতের মাত্রাকে আরো তীব্রতর, আরো ভয়ংকর, আরো ভ্রাতৃঘাতী করার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। রাজনৈতিক মতভিন্নতার মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য, সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সামান্যতম উদ্যোগ, ক্ষীণতম আকাংখা রাজনৈতিক দলগুলি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে।

সর্বনাশা রাজনীতি থেকে কখন রেহাই পাবো ?

রাজনীতিকে বলা হয় মানুষে মানুষে সমঝোতা সৃষ্টির একটা শিল্পকর্ম। রাজনীতিবিদ হচ্ছেন সমঝোতা তৈরীর নিপুণ শিল্পী। আমাদের রাজনীতি হয়ে দাড়িয়েছে ঠিক উল্টোটা। আমাদের রাজনীতিবিদরা হয়ে দাড়িয়েছেন পুরনো ক্ষতকে খুঁছিয়ে খুঁছিয়ে দগদগে বিশাল ঘায়ে রূপান্তরিত করার শিল্পী। তাঁরা ক্ষতের সন্ধানে থাকেন। ছোট্ট একটা ক্ষত পেলেই হলো। এটাকে তাঁরা টেনে হিঁচড়ে এমন ক্ষতে পরিণত করার চেষ্টায় নিয়োজিত হন যাতে কোনদিন কেউ এটাকে মুছে দিতে না-পারে। নিরাময়ের পথকে আমাদের রাজনীতি রীতিমত ঘৃণা করে।

২০১০ সালের মধ্যে যে বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনার কথা আমরা চিন্তা করছি সেটা সন্ত্রাসমুখর, নেতিবাচক রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সম্ভব নয়। সন্ত্রাসী রাজনীতি হলো পেছনে-পড়ে- থাকার রাজনীতি। পঁচে মরার রাজনীতি। পদে পদে মুখ-থুবড়ে-পড়ার রাজনীতি। সবল জাতিকে বিকলাঙ্গ করার রাজনীতি। জাতিকে সামনে যেতে হলে জাতির রাজনীতিকে মানুষের মনে কর্মস্পৃহা জাগানোর রাজনীতি হতে হবে, পরস্পরকে শ্রদ্ধা করার রাজনীতি হতে হবে, পরস্পরের আস্থাভাজন হয়ে একসঙ্গে কাজ করার রাজনীতি হতে হবে। রাজনীতিবিদদেরকে অর্থনৈতিক মহাকর্মকান্ডের আয়োজনে নেতৃত্ব দেবার শিল্পী হতে হবে। ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করার শিল্পী হতে হবে।

জাতির সামনে এখন সব চাইতে বড় রাজনৈতিক ইস্যু হচ্ছে বর্তমান সর্বনাশা রাজনীতি থেকে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে রক্ষা করবো? সুশীল রাজনীতি কিভাবে সৃষ্টি করবো ? কদ্দিন লাগবে সুশীল রাজনীতি সৃষ্টি করতে?

অসহায় জাতি দুই প্রধান নেত্রীর কাছে হাত জোড় করে আবেদন জানাতে পারে --- আমাদেরকে রক্ষা করুন। আপনারা দু'জনে বসে ঠিক করে নিন আপনারা পালাক্রমে আগামী দশ বছর দেশ শাসন করবেন। আপনারা দু'জনে যেভাবে হুকুম করবেন আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। আপনারা শুধু জাতির কাছে ওয়াদা করুন আপনারা দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করবেন। একে অন্যের প্রতি সহযোগিতা দেবেন। যিনি শাসক দলের প্রধান হবেন তিনি বিরোধীদলের মতামতকে সর্বো"চ গুরুত্ব দেবেন। বিরোধীদল সরকারের ন্যায্য সমালোচনা করবে, একই সঙ্গে দেশের স্বার্থে সরকারের কর্মকান্ডে সহযোগিতা দেবে।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যাঁরা সন্ত্রাসকে ঘৃণা করেন তাঁরা নিজ নিজ দলকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য দৃঢ় অবস্থান নিন। দলের মধ্যে শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলুন। অপর দলের শুভশক্তির প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিন। সন্ত্রাসের আগুন নিভাতে না-পারলে এই আগুনে আমরা সবাই পুড়ে মরবো।

রাজনৈতিক দলসমূহের ভেতর যাঁরা সহযোগিতার কথা বলবেন, শান্তির কথা স্পষ্টভাবে বলবেন তাঁদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে ব্যক্তিগত চিঠি লিখুন। তাদেরকে উৎসাহিত করুন। তাদেরকে জানাতে থাকুন যে জাতি তাঁদের পেছনে আছে।

সকল শ্রেণীর মানুষ নিজ নিজ সভা-সমিতিতে, আলোচনা বৈঠকে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, ব্যক্তিগত আলোচনার সময় বলতে থাকুন আমরা সন্ত্রাসকে ঘৃণা করি। আপনারা সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

রাজনীতিবিদদের ছেলেমেয়েরা, আত্মীয়স্বজনরা, বন্ধুবান্ধবরা যারা কাছে আছেন, যারা দূরে আছেন সবাই নিজ নিজ আত্মীয়-বন্ধুকে কঠোরভাবে বলুন ঃ আপনি সন্ত্রাসবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করুন। দলের মধ্যে আপনার ভূমিকা সো”চারে তুলে ধরুন। এই কথা বারবার বলুন, বলে বলে বারবার চিঠি লিখুন, ফোন করুন। সামনাসামনি হলেই বলতে থাকুন। সুযোগ হলেই বলতে থাকুন।

আগামী সাধারণ নির্বাচন বেশী দূরে নয়। এই নির্বাচনে যাতে কালো টাকার জোরে, সন্ত্রাসের আতংক সৃষ্টি করে যাঁরা সংসদে নির্বাচিত হতে চান তাঁরা যাতে সংসদের বারান্দা মাড়াবার সুযোগ না-পান তার আয়োজন করতে হবে। দেশের ভালো মানুষদের নিজ নিজ সংগঠনে তৎপর হতে হবে। নিজ নিজ কর্মপরিধির আওতায় প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রথম কাজ হবে এধরণের প্রার্থীরা যাতে কোন দলের মনোনয়ন না-পায় তার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপের চেষ্টা হবে যদি কেউ কোন দলের মনোনয়ন পেয়েও যান তবে সবাই একজোট হয়ে নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করা যাতে কেউ তাঁদের ভোট না-দেন। এমন কি নিজের দলের মনোনয়ন পেয়ে গেলেও খোলাখুলিভাবে এরকম প্রার্থীর বিরোধিতা করা। আগামী নির্বাচন আমাদের জন্য একটা বিরাট সুযোগ আনছে সন্ত্রাসের শক্তিকে বিদায় দেবার জন্য। আমাদেরকে এসুযোগ গ্রহণ করতেই হবে।

সন্ত্রাস নির্মূলের এই উদ্যোগের ফলাফল কী হতে পারে ? শান্তিপ্রিয়, আইনপ্রিয় জাতি এমনভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে গেলে একাজে আশাতীত সাফল্য অর্জন হতে পারে। কিংবা আংশিক সাফল্য লাভ হতে পারে। কিংবা এই উদ্যোগে কোন ফল লাভ নাও হতে পারে --- শুধু ব্যর্থতার গ্লানি সবাইকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে।

ফলাফল যা-ই হোক চেষ্টা করতেই হবে। হাল ছেড়ে দেবার উপায় নাই।

চলুন সবাই মিলে আরো বুদ্ধি বের করি কিভাবে সর্বনাশা রাজনীতিকে পরম উদ্দীপনার, পরম সৌহার্দ্যের রাজনীতিতে পরিণত করতে পারি।

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষের বয়স বিশ বছরের নীচে। আমাদের রাজনীতি সঠিক পথে না-আসলে এই তরুণদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তোমরা তরুণরা তোমাদের ভবিষ্যৎ-কে অন্ধকার হতে দিও না। তোমাদের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। এটা কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিও না। আমাদের সকল রাজনীতিবিদদের কাছে তোমরা আবেদন জানাও --- সন্ত্রাস পরিহার করুন। শান্তির পথে আসুন। সৌহার্দ্যের পথে আসুন। আপনাদের খেলায় আমাদেরকে ডুবিয়ে মারবেন না।

সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে না-পারলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মেয়েরা, কিশোরীরা, তরুণীরা। তোমাদের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকারে ঢেকে যাবে। সন্ত্রাসকে আর বাড়তে দিও না।

<u>বেহাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা</u>

আগ্নেয়াস্ত্র আর পেশীশক্তির উপর রাজনীতি নির্ভরশীল হবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও বেহাল হয়ে পড়েছে। রাজনীতিবিদরা হচ্ছেন সরকারের সর্বোচ্চ হুকুমদাতা এবং রাষ্ট্রের আইন বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তাঁরাই যদি আইন পালনে সর্বোচ্চ রকম যত্নবান না-হন তাহলে আইন বাস্তবায়নের উপর ভরসা রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রীয় শক্তি সন্ত্রাস-ভিত্তিক রাজনীতির দখলে থাকবে, আর দেশে আইনের শাসন থাকবে এটা হবে সোনার পাথর বাটির মত কথা। সন্ত্রাসগ্রস্ত রাজনীতি আইনের রক্ষক না-হয়ে আইন ভঙ্গকারী শক্তিতে পরিণত হতে বাধ্য। উপরে আইন ভাংগা সহজ হলে সেটা প্রশাসনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়তে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। দুর্নীতি আর সন্ত্রাস সহোদর ভাই। তার সঙ্গে সহজে এসে যোগ দেয় অদক্ষতা, অকর্মন্যতা, দায়িত্ব পালনে প্রবল বিতৃষ্ণা, কর্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এরপর কোনটা আইন, কোনটা আইন নয়, কোনটা

ন্যায়, কোনটা অন্যায় এই জ্ঞান খুব একটা থাকে না। প্রশাসনিক ব্যবস্থা এপর্যায়ে পৌঁছলে তখন রাতকে দিন, দিনকে রাত বলতে কোন কর্মকর্তা অস্বস্তি বোধ করে না।

আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আইন কতটুকু নিজের অধিকার বজায় রাখতে পারছে, সরকারী কর্মকর্তারা আইন মানা ছেড়ে দিয়ে হুকুম মানায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কিনা, দুর্নীতির মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে আছে, নাকি অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে, কালো টাকা কাদের হাতে কি পরিমাণ এগুলি নিয়ে বাক্য ব্যয় না-করেই বলা যেতে পারে যে মানুষ আইনের শাসনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দিহান।

দেশের কেউ আইনের উর্ধে নন, কেউ আইনের ছায়া থেকে বঞ্চিত নন, আইনের চোখে সকল নাগরিক সমান --- এই নিশ্চয়তা আমরা কখন পাবো আমাদের সরকারের কাছ থেকে ? বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে আমাদের এই দরিদ্র দেশকে টিকে থাকতে হলে সর্বপ্রথম তাকে নিশ্চিত করতে হবে আইনের শাসন। যদি আমরা সুশৃংখল নিয়মানুগ জীবন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হই তাহলে এই বিশাল জনগোষ্ঠী উশৃঙ্খল আত্মঘাতী শক্তিতে পরিণত হতে বাধ্য হবে। আমাদের পরম আশ্রয় আইনের শাসন। আমাদের রাজনীতিকে উন্নয়নের শক্তিতে পরিণত করতে হলে আইনের শাসনই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এর ব্যতিক্রম মানেই মহা বিপদ। এর ব্যতিক্রম মানেই হাতাশার অতলে তলিয়ে যাওয়া।

দুর্নীতি আর অদক্ষতার প্রবল বন্যার মাঝখানেও আমাদের সরকারী কাঠামোর মধ্যে অত্যন্ত দক্ষ, সাহসী, এবং সৎ বহু কর্মকর্তা আছেন। তাঁরা সাগরের পানিতে পর্বতসমৃদ্ধ দ্বীপের মত জেগে আছেন। তাঁরা আছেন বলেই দেশ এখনো চলছে। তাঁরা আমাদের গর্ব। তাঁদের প্রতি সালাম জানাই। তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করেন, অনুসরন করেন এমন তরুণ কর্মকর্তারাও আছেন। তাঁরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে আইনের শাসনের দিকে আমরা অগ্রসর হতেও পারি। সরকারী কর্মকর্তাদের শুধু প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আইন মানবো, আইনের উপর ভিত্তি-করা হুকুম মানবো। যা আইনের বাইরে তা আমাদের করণীয়ের বাইরে। আমাদের কাজ আইন বাস্তবায়ন করা। কোন অবস্থাতেই আমরা আইনভঙ্গকারী হবো না।

যদি অর্থনৈতিক মহাকর্মকান্ডের বিরাট উদ্যোগ নিয়ে নামতে চাই আপনাদের ভূমিকাই হবে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা আইনের শাসন নিশ্চিত করুন, আমরা নাগরিকরা মহাকর্মকান্ডের সমস্ত কাজ সফলভাবে সমাপন করে দেবো। দেশের সকল মানুষ এরজন্য আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। শুধু আইন-মানার এবং আইন মানানোর সাহসটুকু আপনারা দেখান।

বিকৃত রাজনীতির পাল্লায় পড়ে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন নদীশিকস্তির পাল্লায় পড়া খাড়া নদীর পাড়ের মত চাকা চাকা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তেমনি ধ্বসে যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যখন প্রতিদিন আরো উন্নততর হবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আগামীদিনের সমাজের নেতৃবৃন্দকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রতিযোগিতা লেগেছে আগামীদিনের জন্য ভয়ংকর সন্ত্রাসী তৈরী করে দেয়ার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো আগামীদিন রচনা করা --- আগামীদিনের মানুষ, আগামীদিনের চিন্তা, আগামীদিনের জীবনযাত্রা তৈরী করা। বর্তমানকে রদবদল করে উন্নততর ভবিষ্যৎ তৈরী করা। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্তমানে প্রচলিত ধারণাগুলি, তত্ত্বগুলি, কাঠামোগুলিকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করা হয়, তার বদলে নতুন তত্ত্ব, নতুন ধারণা, নতুন কাঠামো সৃষ্টির জন্য অনবরত প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হয়। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনকে মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তার দুর্গ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের বড় দায়িত্ব হলো উন্নততর বুদ্ধি এবং সম্ভাবনাময় ধারণাগুলিকে সর্বক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করে সেগুলিকে নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে পরিশীলিত করে আগামীদিনের উন্নততর জীবনের ভিত্তি তৈরী করে দেয়া। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্পষ্টতঃ তাদের এই মিশন হারিয়ে ফেলছে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে এখন সর্বোত্তম ধারণাগুলি এবং অভিজ্ঞতাগুলিকে স্বাগতঃ জানানোর পরিবর্তে স্বাগতঃ জানানো হচ্ছে সমাজের সর্বাধম প্রবৃত্তিগুলিকে। সেখানে এগুলি পরম যত্নে লালিত হচ্ছে। পুষ্টি সমৃদ্ধ হয়ে নিকৃষ্টতম রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসে যখন তারা সমাজকে শাসন করবে তখন দ্রুতবেগে পেছন দিকে ছোটা ছাড়া সমাজের আর কিছু করার উপায় থাকবে না। তাহলে আমাদের সামনে যাবার নেতৃত্ব দেবার মানুষ কোথায় তৈরী হবে ?

আমাদের সমাজপতিদের কাছে একান্ত অনুরোধ আমাদের তরুণদের রেহাই দিন। তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ দিন। আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করুন। শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বারেবারে জাতির নেতৃবৃন্দের কাছে এ আবেদন রেখে চলেছেন। কাউকে না কাউকে একাজটা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সারা জাতির ভবিষ্যৎ জড়িত রয়েছে এর সঙ্গে। যেহেতু প্রবীণরা এটা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তরুণদেরকে তাদের নিজেদের স্বার্থে এই ইস্যুটির পেছনে লাগতে হবে।

পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এগুতে চাই

২০১০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের একটা বিরাট পরিবর্তন সম্ভব। বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তিসৃষ্ট বিশাল অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মুখোমুখি বাংলাদেশের সম্ভাবনার চিত্রটি প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এই নিশ্চিত চিত্রটি ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে একমাত্র আমাদের বর্তমান রাজনীতির কারণে।

আমরা এগুবো তো অবশ্যই। সকল রকম পরিস্থিতিতেই আমাদের কিছু কিছু অগ্রগতি হবে। অতীতে যেমন হয়েছে। কিন্তু আর টুকটুক করে ধুকে ধুকে এগুতে চাই না। এবার বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের মত পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এগুতে চাই। আনন্দ নিয়ে এগুতে চাই। উৎসব করে এগুতে চাই। নিজেদের সন্তান-সন্ততির কাছে "হিরো"-র ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে এগুতে চাই। দুনিয়াকে জানান দিয়ে এগুতে চাই।

স্বাগতঃ নতুন সহস্রাবদ্ধ।

স্বাগতঃ বাংলাদেশ ২০১০।